Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, Published on July issue 2025, Page No. 581 - 596
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

বাংলা আলাপন সাহিত্যের ধারা : একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা

অলোক চন্দ
গবেষক, কটন বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : avradeepchanda2012@gmail.com

Received Date *25. 06. 2025*
Selection Date *20. 07. 2025*

Keyword
Communion literature, Ancient indian literature, Kathamrita, Books of Anukulchandra Chakraborty,

Abstract
We are discussing about the growth and development of Bengali communion literature. At the very beginning, we will see what communion is. We know that communion is when two or more people discuss or talk about any particular issue or various issue, and when this discussion goes beyond our personal need and literary anger erupts, that is called as communion literature.

To see about Bengali communion literature's origin and growth, we noticed that before the origination of Bengali literature, we got the quest of communion in Ancient Indian Literature.

We have found instances of discourse in some ancient indian literature like the great two epic 'The Ramayana' and 'The Mahabharata', 'The Brihadaranyaka Upanishad', the great conversation between Shri Krishna and Arjuna in 'The Srimadbagbadgeeta'. Not just that we also got this information about discourses in Buddhist religious book – Tripitaks 'Suttapitak'. That is in this trend of conversation was among there were various literary antigact of ancient indian literature. We have also received this tradition of Indian Literature in Bengali literature. For the earliest example of Bengali literature 'The Charyapada', we have received the essence of conversation.

After the Charyapada, when we explore the various literary examples of Bengali literature one by one, we notice numerous examples of conversation. In Mukunda Chakrabarty's 'Avayamangal' other Mangalkabya's, in middle age of Bengali literature, Bharatchandra Roy's 'Anndamangal Kabya'. Krishna Das Kabiraj Goswami's 'Srisrichaitnyacharitamrito', Brindaban Das's 'Chaitanyavagbad' and in Bengali translated literature (The Ramayana of Krittibas Ojha and The Mahabharata of Kashiram Das) we have seen the style of conversation and have also mentioned it. Not only that, there is direct conversation between Krishna, Radha and Barai in Baruchandidas's 'Shrikrishnakirtan' and also in the 'Maimanshiha ballads'

In the modern era of Bengali literature, we have seen discourses of various characters in Madhusudan Dutta's 'Meghbadbadh', Bamkimchandra's 'Dharmatatwa', Swami Vivekananda's 'Swami-Shisya sambad',

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 69
Website: https://tirj.org.in, Page No. 581 - 596
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Rabindranath's 'Panchavut', and many others. But the books in Bengali literature that are completely based on conversation, we have seen in Ramakrishna 'Kathamrita' and in Anukulchandra Chakraborty's 48 books.

Not just conversation, within all this conversation, we have observed various qualities of literature and that is why, I am saying that discourses can also attain the dignity of literature.

Discussion

শিরোনাম দেখে আমরা আঁচ করতে পারছি যে, আমাদের আলোচনার মূল আলাপন সাহিত্য এবং সেই সঙ্গে আলাপন সাহিত্যে অনুকূলচন্দ্র চক্রবর্তীর ভূমিকা কোথায়, তাই নিয়ে। তবে তার আগে আমাদের দেখে নিতে হবে আলাপন বিষয়টা কী? তারপরে আলোচনা করব আলাপন কখন সাহিত্য হয়ে ওঠে। আমরা জানি, আমাদের সাহিত্যে লিখিত ও মৌখিক দুটি রূপই ছিল। লিখিত রূপ আত্মপ্রকাশ করার আগেই মৌখিক শিরোনাম রূপটি সমহিমায় ছিল। পণ্ডিতেরাও সেকথা স্বীকার করেছেন। পণ্ডিতেরা লিখিত রূপকে নানাভাবে প্রকাশ করেছেন, নানা সময়ে। কিন্তু মৌখিক রূপটি থেকে গেছে শিষ্টজনের আড়ালে।

সাহিত্যের মৌখিক যেই রূপটি সেটি অনেক সময়েই প্রকাশের মাধ্যম করেছে কথোপকথনকে। পারস্পরিক যেই কথা-বার্তা, আলোচনা তাকেই আমরা বলি আলাপ। মৈমনসিংহ-গীতিকার বিভিন্ন পালা হোক বা শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে রাধা, কৃষ্ণ ও বড়াইয়ের মধ্যে কথা-বার্তা হোক কিম্বা রবীন্দ্রনাথের পঞ্চভূত-এর বিভিন্ন প্রবন্ধ হোক — সব জায়গাতেই আমরা আলাপন বা পারস্পরিক কথোপকথনের ভঙ্গি লক্ষ্য করেছি। এইগুলো নিয়ে পরবর্তীতে আমরা আলোচনা করব। ইতিমধ্যেই আমরা বুঝতে পেরেছি আলাপ বা আলাপন কী। অভিধানে আলাপ শব্দের অর্থ হল — পরস্পর কথন। আ + √লপ্ + অ (ঘঞ্) - ভা (বঙ্গীয় শব্দকোষ, প্রথম খণ্ড, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ, ১৩৪০-১৩৫৩ বঙ্গাব্দ, কলকাতা - ০৯, শ্রী সরস্বতী প্রেস লিমিটেড, পৃষ্ঠা নম্বর : ৩১৭/সংসদ বাংলা অভিধান, শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, ষষ্ঠ মুদ্রণ, কলকাতা ০৯, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড, পৃষ্ঠা নম্বর : ১০৬ / বাঙ্গালা ভাষার অভিধান, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, ইন্ডিয়ান পাবলিসিং হাউস, কলকাতা, পৃষ্ঠা নম্বর : ১৯৮ / নূতন বাঙ্গালা অভিধান, আশুতোষ দেব, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৫৯, কলকাতা-০৯, দেবসাহিত্য কুটীর, পৃষ্ঠা নম্বর : ২২৮ / চলন্তিকা, [আধুনিক বঙ্গভাষার অভিধান] রাজশেখর বসু, সপ্তম সংস্করণ, কলকাতা - ১২, এম, সি, সরকার এন্ড সন্স লিমিটেড, পৃষ্ঠা নম্বর : ৬০, বাঙ্গালা শব্দকোষ, প্রথম খণ্ড, শ্রী যোগেশচন্দ্র রায়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩২০ বঙ্গাব্দ, কলকাতা, আপার সারকুলার রোড ২৪৩/১, পৃষ্ঠা নম্বর : ৫১)

আলাপ বা আলাপন বলতে তাই আমরা বুঝি একের বেশি মানুষের মধ্যে পরস্পর কথা। কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার ছবিই শুধু ফুঁটে ওঠেনি, সেইসঙ্গে মানুষের প্রতিদিনের সমস্যার ভেতর দিয়ে সাহিত্যরসও জমে উঠেছে। আলাপের ভেতর দিয়ে এইভাবে সাহিত্যরস বা সাহিত্যিক ব্যঞ্জনা সৃষ্টি সত্যিই বিস্ময়কর। আবার কখনও-কখনও আলাপনকে কেন্দ্র করে পুরো রচনাই হয়ে উঠেছে সাহিত্য পদবাচ্য। এইরকম নিদর্শনও আমরা পেয়েছি। আবার কোথাও আলাপনটাই মুখ্য।

আমাদের দেশের বিভিন গ্রন্থ যেমন, বেদ, উপনিষদ কিম্বা বিভিন্ন পুরাণ সেইসঙ্গে রামায়ণ, মহাভারতে আলাপন রয়েছে। বাংলা সাহিত্যেও এই রকম উদাহরণ আছে। আলাপ-আলোচনা নির্ভর সাহিত্য, যেখানে কথোপকথনটাই আসল আর এরই মধ্যে দিয়ে সাহিত্যগুণ, সমস্ত বৈশিষ্ট্য নিয়ে হাজির হয়, সেই জাতীয় সাহিত্যকেই আমরা বলছি 'আলাপন সাহিত্য'। আমরা আলাপন সাহিত্য বলছি এর পেছনেও কারণ আছে। প্রাচীন ভারতে এবং বাংলা সাহিত্যে এমন কতগুলো গ্রন্থ আছে যেগুলো কথোপকথন নির্ভর। যেন স্রষ্টার পুরো সৃষ্টি জুড়েই চলছে কথা। আর এই কথা চলতে-চলতেই সেখানে সাহিত্যরস বিকশিত উঠেছে।

প্রাচীন ভারতের আর্যাবর্তে আমরা গুরু-শিষ্য পরম্পরার কথা জানি। গুরু ও শিষ্যের মধ্যে কথোপকথন চলে। শিষ্যরা নানা বিষয়কেন্দ্রিক প্রশ্ন গুরুকে করতেন। গুরু সেগুলোর উত্তর দিতেন। সেই প্রশ্নের মধ্যে শুধু জীবনের বিভিন্ন সমস্যার কথাই থাকত না, সেইসঙ্গে দর্শন, অধ্যাত্ম, শিক্ষা বিষয়ক প্রশ্নও থাকত। এই প্রশ্ন-উত্তরের মূল মাধ্যমই ছিল

কথোপকথন। আমাদের দেশের বিভিন্ন গ্রন্থ যেমন, রামায়ণ, মহাভারত, বৃহদারণ্যকোপনিষদ, ত্রিপিটক, শ্রীমদ্ভগবদগীতা প্রভৃতি গ্রন্থেও আমরা কথোপকথন পেয়েছি। আমরা যখন বাংলা সাহিত্যে চোখ রাখি সেখানেও কথোপকথনের প্রাধান্য রয়েছে কিম্বা কথোপকথনধর্মী অনেক গ্রন্থ দেখি। বলাবাহুল্য কথোপকথনের আরেকটি রূপ মৌখিক অর্থাৎ মুখে-মুখে দীর্ঘদিন সাধারণ জন-মনের মধ্যেও ছিল। পরবর্তীতে গুণীজনেরা সেগুলো লিপিবদ্ধ করেছেন। আবার আলাপনের ঢঙ আমরা বৈঠকি গল্পের মধ্যেও লক্ষ্য করেছি। পরবর্তীতে এই বিষয়টি নিয়েও আমরা আলোচনা করব।

আলাপন সাহিত্যের প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই যেই গ্রন্থের কথা আমাদের মনে আসে, সেটি ভারতীয় পরম্পরার অন্যতম দুটি মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত। মূল রামায়ণে আমরা অনেক জায়গায় আলাপন বা কথোপকথন দেখেছি। 'বালকাণ্ডে' নারদ ও বাল্মীকির মধ্যে, 'অযোধ্যাকাণ্ডে' দশরথের অভিলাষ, রামের অভিষেক, মন্থরার মন্ত্রণা, কৌশল্যা ও লক্ষণের মধ্যে, দশরথ ও কৌশল্যার সন্তানের জন্য দু:খ, রাম ও ভরতের মিলন অংশে, রাবন ও মারীচের মধ্যে কথোপকথন অংশে, কিস্কিন্ধ্যাকাণ্ডে হনুমান ও লক্ষণের মধ্যে কথা, বালি ও রামের কথা, 'সুন্দরকাণ্ডে' হনুমান ও সীতার মধ্যে কথোপকথন, 'যুদ্ধকাণ্ডে' ভরত ও হনুমানের কথা, প্রভৃতি অংশে আমরা দুই বা তার বেশি চরত্রের মধ্যে আলাপন দেখেছি। এছাড়াও রামায়ণের বিভিন্ন অংশে টুকরো-টুকরো অনেক কথোপকথন রয়েছে। আমরা আলোচনার সুবিধার জন্য কৈকেয়ী ও মন্থরার মধ্যে কথোপকথনের কিছু অংশ এখানে তুলে ধরছি। রামের রাজ্যাভিষেকের কথা শুনে মন্থরা কেমন করে কৈকেয়ীর কাছে সেই কথাকে পরিবেশন করেছে, নিম্নোক্ত কথোপকথনে সেই বিষয়টি বোঝা যায়, —

"উত্তিষ্ঠ মূঢে কিং শেষে ভয়ং ত্বামভিবর্ততে।
উপপ্লুতমঘৌঘেন নাত্মানমববুধ্যসে।।
অনিষ্টে সুভগাকারে সৌভাগ্যেন বিকত্থসে।
চলং হি তব সৌভাগ্যং নদ্যাঃ স্রোত ইবোষ্ণগে।।"[১]

কৈকেয়ীর মনে প্রথমে রামের প্রতি কোনরকম বিরুদ্ধ ভাব না থাকায়, তিনি এই খবরে খুশি হয়ে মন্থরাকে বলেন, —

"রামে বা ভরতে বাহং বিশেষং নোপলক্ষয়ে।
তস্মাৎ তুষ্টাস্মি যদ্ রাজা রামং রাজ্যেঽভিষেক্ষ্যতি।।"[২]

ভরত, দাদার বনবাসের কথা শুনে সুমন্ত্রর কাছে ভরদ্বাজ আশ্রমের বিষয়ে জানতে চাওয়ার সময়, দুজনের মধ্যে কথা-বার্তার কিছু অংশ এখানে তুলে ধরছি, —

"কচ্চিন্ন দুষ্টো ব্রজসি রামস্যাক্লিষ্টকর্মণঃ।
ইয়ং তে মহতী সেনা শঙ্কাং জনয়তীব মে।।"[৩]

আবার রামচন্দ্রের সঙ্গে দেখা হওয়ার পরে দাদা ও ভাইয়ের মধ্যের আলাপনও আমরা এখানে তুলে ধরছি, —

"আক্রোশং মম মাতুশ্চ প্রমৃজ্য পুরুষর্ষভ।
অদ্য তত্রভবন্তং চ পিতরং রক্ষ কিল্বিষাৎ।।
শিরসা ত্বাভিযাচেঽহং কুরুষ্ব করুণাং ময়ি।
বান্ধবেষু চ সর্বেষু ভূতেষ্বিব মহেশ্বরঃ।।"[৪]

এর উত্তরে রাম, ভরতকে বলেন, —

"ত্বং রাজা ভরত ভব স্বয়ং নরাণাং
বন্যানামহমপি রাজরাণ্ মৃগাণাম্।
গচ্ছ ত্বং পুরবরমদ্য সংপ্রহৃষ্টঃ
সংহৃষ্টস্ত্বহমপি দণ্ডকান্ প্রবেক্ষ্যে।।"[৫]

প্রাচীন ভারতের আরেকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল মহাভারত। রামায়ণের মতো এই গ্রন্থেও কথোপকথন রয়েছে। মহাভারতে যযাতি ও অষ্টকের, কুন্তী ও ব্রাহ্মণের, এছাড়াও বিভিন্ন পর্বে যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, দ্রৌপদী, কৃষ্ণ, কুন্তী, কর্ণ,

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 69
Website: https://tirj.org.in, Page No. 581 - 596
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

দুর্যোধন, ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি চরিত্রের মধ্যে বিভিন্ন সময় আলাপের অনেক দৃষ্টান্ত আমরা পেয়েছি। আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে তুলে ধরছি। নববধূ দ্রৌপদীকে, কুন্তী উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছেন, –

"অতিথিনাগতান্ সাধুন্ বৃদ্ধান্ বালাংস্তথা গুরুন্।
পুজয়ন্ত্যা যথান্যায়ং শশ্বদ্ গচ্ছন্তু তে সমাঃ।।"[৬]

আবার পঞ্চপাণ্ডবদের বেঁচে থাকার কথা শুনে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুরের মধ্যেও কথোপকথন আছে। –

"এবং বিদুর ভদ্রে তে য়দি জীবন্তি পাণ্ডবাঃ।
সাধ্বাচারা তথা কুন্তী সম্বন্ধো দ্রুপদেন চ।।
অন্যবায়ে বসোর্জাতঃ প্রকৃষ্টে মান্যকে কুলে।
ব্রতবিদ্যাতপোবৃদ্ধঃ পার্থিবানাং ধুরন্ধরঃ।।"[৭]

ধৃতরাষ্ট্র এই কথা বলার পর উত্তরে বিদুর মহারাজকে বলেন, –

"তং তথা ভাষমাণং তু বিদুরঃ প্রত্যভাষত।
নিত্যং ভবতু তে বুদ্ধিরেষা রাজঞ্ছতং সমাঃ।
ইত্যুকত্বা প্রযযৌ রাজন্ বিদুরঃ স্বং নিবেশনম্।।"[৮]

ধৃতরাষ্ট্রের পাণ্ডবদের প্রতি এই সহানুভূতির কথা শুনে দুর্যোধন মহারাজকে বলেন, –

"সপত্নবৃদ্ধি য়ত্ তাত মন্যসে বৃদ্ধিমাত্মনঃ।
অভিষ্টৌষি চ য়ত্ ক্ষতুঃ সমীপে দ্বিষতাং বর।।"[৯]

'বৃহদারণ্যকোপনিষদ' গ্রন্থেও কথোপকথন রয়েছে। এখানে আত্মা সম্পর্কে আলাপন রয়েছে গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে, ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য ও মৈত্রেয়ীর মধ্যে। গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে জনক ও যাজ্ঞবল্ক্য, গার্গী ও যাজ্ঞবল্ক্য এবং কহোল ও যাজ্ঞবল্ক্যের মধ্যে এবং চতুর্থ অধ্যায়ে জনক ও যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির মধ্যে কথোপকথন আছে। মূলত আত্মা, জন্ম, মুক্তি ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কিত আলোচনা এখানে স্থান পেয়েছে।

কথোপকথনে সমৃদ্ধ একটি অন্যতম গ্রন্থ হল 'শ্রীমদ্ভগবদগীতা'। গ্রন্থটিতে মোট ১৮ টি অধ্যায় আছে। 'বিষাদ যোগ' থেকে শুরু করে 'মোক্ষযোগ' পর্যন্ত প্রতিটি অধ্যায়ে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে নানান প্রশ্ন করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ সেগুলোর উত্তর দিয়েছেন। গুরু-শিষ্য পরম্পরা। পুরো গ্রন্থে ছড়িয়ে আছে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের কথোপকথন। আমরা এখানে 'শ্রীমদ্ভগবদগীতা' থেকে এইরকম কিছু কথোপকথন তুলে ধরছি আলোচনার সুবিধার জন্য। কর্ম সম্বন্ধে অর্জুন 'কর্মসন্ন্যাস-যোগ' অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞেস করেন, –

"সন্ন্যাসং কর্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগং চ শংসসি।
যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্।।"[১০]

উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বকেন, –

"সন্ন্যাসঃ কর্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্মসন্ন্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষ্যতে।।"[১১]

'অক্ষরব্রহ্ম-যোগ' অধ্যায়ে অর্জুন, শ্রীকৃষ্ণর কাছে জানতে চান জিতেন্দ্রিয় মানুষেরা কেমন করে তাকে জানতে ও বুঝতে পারবেন,–

"অধিযজ্ঞঃ কথং কোহত্র দেহেহস্মিন্নধুসূদন।
প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োহসি নিয়তাত্মভিঃ।।"[১২]

অর্জুনের এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলেন, –

"অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং স্বভাবোহধ্যাত্মমুচ্যতে।
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ।।"[১৩]

আবার তিনি আরও বলেন, –

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 69
Website: https://tirj.org.in, Page No. 581 - 596
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

"যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ।।"[১৪]

উপরিউক্ত গ্রন্থগুলো ছাড়াও বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ ত্রিপিটকেও আমরা আলাপন দেখেছি। ত্রিপিটকের একটি অন্যতম অংশ 'সুত্তপিটক'। সুত্তপিটকের বিভিন্ন জায়গায় বুদ্ধদেব ও তাঁর শিষ্যদের মধ্যে নানান বিষয় নিয়ে কথোপকথন রয়েছে।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন গ্রন্থ এবং তার মধ্যে কথোপকথন কোথায়-কোথায় রয়েছে সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। এবারে আমরা দেখানোর চেষ্টা করব ভারতীয় পরম্পরার এই ধারা বাংলা সাহিত্যে কিভাবে এবং কোন পথ ধরে এসেছে। বাংলা সাহিত্যের বিশাল এবং দীর্ঘ ইতিহাস যদি আমরা দেখি তাহলে সেখানেও আমরা আলাপন দেখতে পাব। কোথাও কথোপকথন এসেছে কোন প্রসঙ্গ ধরে, কোথাও রচনার অনেকটা অংশ জুড়ে আবার কোথাও পুরো রচনাটাই আলাপন নির্ভর। আমরা এবারে বাংলা সাহিত্যে সেইসব রচনা আর লেখার দিকে নজর দেব।

বাংলা সাহিত্যের আদি ও প্রাচীনতম গ্রন্থ 'চর্যাপদ'। গ্রন্থটিতে বৌদ্ধ সহজিয়া ভাবনার কথা বিভিন্নভাবে সাধারণ জনের সরাসরি বোঝার অনুপযুক্ত করে বলা হয়েছে। তার পেছনেও অবশ্য অনেক কারণ ছিল। কিন্তু এই কথাগুলো বলতে গিয়ে পদকর্তাদের মধ্যে কোথাও গুরু-শিষ্য পরম্পরা আবার কোথাও আলাপনের সুর লক্ষ্য করেছি আমরা। যদিও চর্যাগানগুলোতে সরাসরি কথোপকথনের কোন উল্লেখ নেই, কিন্তু আবছা একটি আভাস সেখানে আছে। আমাদের এই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে আমরা চর্যাপদ থেকে এইরকম কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে তুলে ধরছি।

৮ নম্বর চর্যায় আছে, —

"বাহুত কামলি গঅণ উবেসেঁ।
গেলী জাম বহুড়ই কইসে।।
খুন্টি উপাড়ী মেলিলি কাচ্ছী।
বাহুত কামলি সদ্‌গুরু পুচ্ছী।।"[১৫]

এই পদটিতে কামলিকে বলা হয়েছে, সে যেন সাধন মার্গের কথা সদগুরুকে জিজ্ঞেস করে নেয়। আবার ১০ নম্বর পদে আছে,—

"হা লো ডোম্বী তো পুছমি সদভাবে।
আইসসি জাসি ডোম্বী কাহরি নাবেঁ।।"[১৬]

এখানেও আমরা কথোপকথনের আভাস পাচ্ছি। ১৫ নম্বর চর্যা থেকে আমরা আরেকটি উদাহরণ তুলে ধরছি, —

"কুলে কূল মা হোই রে মূঢ়া উজুবাট সংসারা।
বাল তিল একু বাঙ্ক ণ ভুলহ রাজপথ কণ্ঢারা।।"[১৭]

এই পদটিতেও আমরা কথোপকথনের ইঙ্গিত পাই।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম নিদর্শন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য। কাব্যের অন্যতম মূল তিনটি চরিত্র কৃষ্ণ, রাধা ও বড়াই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের ১৩ টি খণ্ডেই আমরা সরাসরি আলাপন লক্ষ্য করেছি রাধা, কৃষ্ণ ও বাড়াইয়ের মধ্যে। তিনটি চরিত্রই যেন একে অপরের সঙ্গে কথা বলছে। আমরা প্রত্যেকটি খণ্ডেই এইরকম অনেক সংলাপ পেয়েছি। আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা 'নৌকাখণ্ড' থেকে একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি। —

"রাধাক না পাআঁ মোর বেআকুল মনে
রাতি দিন নিন্দ না আইসে তাহার কারণে।।
উনমত ভৈলোঁ বড়ায়ি রাধার বিরহে।
তার দরশন বিণি প্রাণ না রহে।।
আইহনের রাণী রাধা বড় আছিদরী।
বোলেঁচালেঁ তোর থান আণিতেঁ না পারী।।
আপণেয়ি কিছু বোল বুদ্ধি পরকার।

OPEN ACCESS *Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 69
Website: https://tirj.org.in, Page No. 581 - 596
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সেহি মতেঁ করিবোঁ তোহ্মার উপকার।।”[১৮]

রাধাকে না পাওয়ার ব্যাকুলতার কথা কৃষ্ণ, বড়াইকে জানালে বড়াই তাকে রাধার বুদ্ধির কথা বলেছে। পরবর্তী দৃষ্টান্ত আমরা ‘বংশীখণ্ড’ থেকে নিচ্ছি। এখানে রাধা ও কৃষ্ণের মধ্যে কথা-বার্তা রয়েছে। —

“বাপ নন্দ গোপ মাঅ যশোদা জগতে বিদিত তোরে।
তার পুত্র হআঁ দেব দামোদর মিছা চুরী দোষ মোরে।।
এথাঞিঁ শিয়রে বাঁশী আরোপিআঁ সুতিআঁ আছিলোঁ আহ্মি।
পাণী নিবারেঁ আসিআঁ সে বাঁশী নিলেহেঁ তুহ্মি।।”[১৯]

কৃষ্ণের বাঁশি চুরি নিয়ে এখানে রাধা ও কৃষ্ণের আলাপ রয়েছে।

বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের অন্যতম দুটি অনুবাদ হল — রামায়ণ ও মাহাভারত। বাংলার সাধারণের ঘরের ভিতরে, ভারতবর্ষের এই দুটি মহাকাব্যকে সহজ-সরল বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে পৌঁছে দিয়েছিলেন কৃত্তিবাস ওঝা, কাশীরাম দাস এবং আরও অনেকে। আমরা মূল রামায়ণ ও মহাভারতের মতো অনুবাদিত অংশেও বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে কথোপকথন দেখেছি। প্রথমেই আসি কৃত্তিবাস ওঝার অনুবাদ করা রামায়ণে। রাজা দশরথের স্ত্রী কৈকেয়ী যুদ্ধে তাঁর প্রাণরক্ষা করলে, দশরথ খুশি হয়ে রাণীকে বর প্রার্থনা করতে বলেন। সেইসময়ে উভয়ের কথোপকথন আমরা এখানে তুলে ধরছি। —

“হে কৈকেয়ী! প্রাণ রক্ষা করিলে আমার।
তোমার সমান মোর কেহ নাহি আর।।
বর মাগি লহ যেবা অভীষ্ট তোমার।
তোমারে অদেয় কিছু নাহিক আমার।।
হাসিয়া কহিল রাণী রাজার সকাশে।
মহারাজে সেবি নাই বর অভিলাষে।।
মহারাজ আজি বরে নাহি প্রয়োজন।
প্রয়োজনে পূরাইও মাগিব তখন।।
আমার সত্যেতে বন্দী রহিলে গোসাঞি।
প্রয়োজন অনুসারে বর যেন পাই।।
নৃপতি বলেন, দিব যাহা চাবে দান।
আছুক অপর দান দিব নজ প্রাণ।।”[২০]

‘অরণ্যকাণ্ডে’ সূর্পণখা এবং খরের মধ্যে কথোপকথন আছে। —

“চৌদ্দজন যুদ্ধে পড়ে সূর্পণখা দেখে।
ত্রাস পেয়ে কহে গিয়া খরের সম্মুখে।।
যুঝিবারে পাঠাইলে ভাই! চৌদ্দজন।
রামের বাণেতে তারা হারাইল প্রাণ।।
খর বলে, দেখ তুমি আমার প্রতাপ।
ঘুচাইব এখনি আমি তোমার মনস্তাপ।।”[২১]

কথোপকথন একটু বড় হলেও, বোঝার সুবিধার জন্য আমরা এখানে উল্লেখ করলাম।

বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের অন্যতম গ্রন্থ হল মহাভারত। কাশীরাম দাসের মহাভারতই বাংলায় ভীষণ জনপ্রিয় হয়েছিল। ‘বনপর্বে’ ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুরের মধ্যে যেই কথা হয়েছে তা এখানে তুলে ধরছি। —

“দ্রৌপদীরে দুঃশাসন কৈল অপমান।
বিনয় করিয়া চাহ ক্ষমা তার স্থান।।
কর্ণে দুর্য্যোধনে কর পাণ্ডবের প্রীত।

এই কর্ম্ম হয় প্রীত দেখি তব হিত।।
তুমি কৈলে যদি নাহি মানে দুর্য্যোধন।
তবেত তাহারে রাখ করিয়া বন্ধন।।
পূর্ব্বে যত বলিলাম করিলে অন্যথা।
এখন যে বলি রাজা রাখ এই কথা।।
জিজ্ঞাসিলে তেঁই এই কহিনু বিচার।
ইহা ভিন্ন অন্ন নাহি উপায় ইহার।।
বিদুর বচন শুনি বলিলেন অন্ধ।
যতেক বলিলা এ সকল কথা মন্দ।।
আপনার মূর্ত্তিভেদ আপন নন্দন।
তারে দুঃখ দিব পর-পুত্রের কারণ।।"[২২]

কাশীদাশী মহাভারতের উদ্যোগপর্বে শ্রীকৃষ্ণ, বিদুরের বাড়িতে গেলে, আনন্দিত বিদুর নিজের অপারগতার কথা তাঁকে জানিয়ে বলেছেন, –

"আমার ভাগ্যের কথা কহিতে না পারি।
কৃপা করি মম গৃহে আসিলে মুরারি।।
কোন্ দ্রব্য দিয়া আমি পূজিব তোমারে।
আছুক অন্যের কাজ অন্ন নাই ঘরে।।"[২৩]

বিদুর শ্রীকৃষ্ণের কাছে তার অনেক অসহায়তার কথা বলেন। উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বলেন, –

"পরম মহৎ তুমি সংসার ভিতরে।
তব তুল্য ধর্ম্মশীল নাহি চরাচরে।।
ভক্তবশ আমি থাকি ভক্তের অধীনে।
অধিক নাহি প্রীতি ভক্তজন বিনে।।"[২৪]

মধ্যযুগের অন্যতম শক্তিশালী কবি মুকুন্দ চক্রবর্তীর 'অভয়ামঙ্গল' কাব্যের মধ্যেও অনেক জায়গায় আলাপন দেখেছি। কালকেতুর অত্যাচারে পশুরা অতিষ্ঠ হয়ে পশুরাজ সিংহের কাছে গিয়ে নিবেদন করে বলেছে, –

"আদ্দাশ করয়ে আসি চমরীর ঘটা।
দেখহ পশুর রাজা সবার লেজ কাটা।।
গণ্ডার কহয়ে আমি বড় দুঃখ পাই।
খড়্গের কারণে মোর মরে দুই ভাই।।
কপি বলে রায় মুই হইনু নির্ব্বংশ।
কালকেতু বান্ধিয়া বেচিল মোর বংশ।।"[২৫]

'চণ্ডীর নিকট পশুগণের দুঃখ-নিবেদন' অংশে দেবী চণ্ডী ও পশুদের মধ্যে কথোপকথনের কিছু অংশ এখানে তুলে ধরছি,–

"চণ্ডী জিজ্ঞাসেন পশুগণে।
একা বীর কালকেতু সবার বধের হেতু
শুনিতে কৌতুক বড় মনে।।
কহে বীর মৃগরাজ কহিতে বাসয়ে লাজ
কালকেতু ভাঙ্গিল দশন।
কৃপা কর কৃপাময়ি তোমার বাহন হই
জীবনে নাহিক প্রয়োজন।।"[২৬]

এইভাবে একে একে বনের পশুরা চণ্ডীর কাছে তাদের দুঃখের কথা জানিয়েছে। বলাবাহুল্য এখানেও আমরা দেবী চণ্ডী এবং পশুদের মধ্যে আলাপ দেখেছি।

বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগের আরেকটি অন্যতম কাব্য শিবায়ন। এই কাব্যেও বিভিন্ন অংশে প্রচুর কথোপকথন আছে বিভিন্ন চরিত্রের সঙ্গে। আমরা কাব্যটি থেকে একটিমাত্র দৃষ্টান্ত তুলে ধরব। ভৃত্য ভীম ও শিবের কথোপকথনের কিছু অংশ এখানে উল্লেখ করছি, —

"প্রভাতে উঠিয়া ভীম ভূতনাথে ভাষে।
চল হর যাব ঘর কাযনাই চাষে।।
যাত্রাকালে যত্ন করে কয়েছিল মামী।
একবার তাঁত তত্ত্ব না করিলে তুমি।।
হৈমবতী হরে দুঁহে হয়ে এক অঙ্গ।
ছ ছ মাস ছাড়িয়া রহিলে প্রিয় সঙ্গ।।
মামী মোর সাবাস জাতির বেটি বটে।
অনুতাপে তোমা সনে লাগিয়াছে হাটে।।
তোকে দুঃখ দিতে মামী মোকে দেয় ঝুড়ে।
মটরের মর্দ্দনে মুসুর গেল উড়ে।।
ভুলে মামী ভৃত্যে মোরে ভাণ করে সব।
শিব কহে শুনিয়া সেবক-মুখ-রব।।
কপর্দ্দির কদর্থন কুমুদার কর্ম্ম।
পর্ব্বতের বেটি মোকে পুড়িলেক জন্ম।।
চষালেক চাষ সেই চেতালেক ফিরে।
মিথ্যা নাহি বলি বাপু আপনার কিরে।।
ঘরে যেতে কার অভিলাষ নাহি হয়।
চলে নাই চরণ চাষের পাইট বয়।।"[২৭]

আলাপনটি একটু বড়, কিন্তু এর মধ্যে দিয়ে ভীম ও শিবের কথোপকথনের পুরো দিকটা ফুঁটে উঠেছে। মধ্যযুগের অন্যতম সাহিত্যিক নিদর্শন মঙ্গলকাব্য, চৈতন্যভাগবত, অন্নদামঙ্গল কাব্যেও আমরা কথোপকথন পেয়েছি। 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য ও রামানন্দের মধ্য কথোপকথন আছে।[২৮] কথোপকথনটি আমরা পেয়েছি মধ্য অধ্যায়ের অষ্টম পরিচ্ছেদে।

আলাপন সাহিত্যের ধারাবাহিকতা দেখতে-দেখতে আমরা যখন 'মৈমনসিংহ-গীতিকা'য় আসি, তখন দেখি আলোচনার শুরুতে আমরা যেই মৌখিক রূপটির কথা বলেছিলাম, সেটি এখানে নিজের অস্তিত্ব আমাদের কাছে প্রমাণ করেছে। আমরা জানি, মৈমনসিংহ-গীতিকার গানগুলো একসময় গ্রাম বাংলার মাটির কাছাকাছি মানুষদের মুখে-মুখে ঘুরে বেড়াত। পরবর্তীতে দীনেশচন্দ্র সেনের উদ্যোগে এবং চন্দ্রকুমার দে মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রমে সেগুলো আমরা হাতের কাছে পেয়েছি। এই গানগুলোও গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষদের জীবন এবং জীবনের নানা গল্প নিয়ে তৈরি। পুরোপুরি আলাপনের ঢঙ আমরা দেখতে পাই মৈমনসিংহ-গীতিকার বিভিন্ন পালায়। বোঝার সুবিধার জন্য আমরা এখানে একটি উদাহরণ তুলে ধরছি। 'মহুয়া' পালায় নদের ঠাকুর ও মহুয়ার জলের ঘাটে দেখা হওয়ার পর কথোপকথনের কিছু অংশ এখানে উল্লেখ করছি, —

"সইন্ধ্যা বেলা জলের ঘাটে একলা যাইও তুমি।
ভরা কলসী কাঙ্কে তোমার তুল্যা দিয়াম আমি।।
কলসী করিয়া কাঙ্কে মহুয়া যায় জলে।
নদ্যার চান ঘাটে গেল সেইনা সইন্ধ্যা কালে।।

'জল ভর সুন্দরী কইন্যা জলে দিছ মন।
কাইল যে কইছিলাম কথা আছে নি স্মরণ।।'
'শুন শুন ভিন দেশী কুমার বলি তোমার ঠাই।
কাইল বা কি কইছলা কথা আমার মনে নাই।।'
নবীন যইবন কইন্যা ভুলা তোমার মন।
এক রাতিরে এই কথাটা হইলে বিস্মরণ।।"[২৯]

মৈমনসিংহ-গীতিকার অন্যান্য পালা অর্থাৎ মলুয়া, চন্দ্রাবতী, কমলা, দেওয়ান-ভাবনা, কাজল রেখা, কঙ্ক ও লীলা, রূপবতী, দেওয়ান-মদিনা, দস্যু কেনারামের পালা ইত্যাদিতেও আলাপন বা কথা-বার্তা আছে।

বাংলা সাহিত্যে আলাপনের ধারার উৎস খুঁজতে-খুঁজতে আমরা যখন মধ্যযুগ পার করে আধুনিক যুগের বিভিন্ন সাহিত্যিক নিদর্শনের দিকে নজর দিই, তখন সেখানেও কথোপকথনের স্টাইল আমরা পেয়েছি। প্রসঙ্গত আধুনি যুগের বাংলা সাহিত্যে যেই গ্রন্থটির কথা আমাদের মনে আসে সেটি হল — 'মেঘনাদবধকাব্য'। নয়টি সর্গে বিভক্ত মধুসূদন দত্তের এই কাব্যটি একটি সাহিত্যিক মহাকাব্য। কাব্যটির বিভিন্ন সর্গে আমরা রাবন, ইন্দ্রজিৎ, বিভীষণ, প্রমীলা প্রভৃতি চরিত্রের মধ্যে কথোপকথন দেখি। বিষয়টি পরিষ্কার করার জন্য আমরা একটি উদাহরণ এখানে দিচ্ছি। —

"আশীষি সুধিলা দেবী; — 'কহ, কি কারণে,
গতি হেথা আজি তব, অদিতি-নন্দন?
উত্তরিলা দেবপতি; — শিবের আদেশে,
মহামায়া, আসিয়াছি তোমার সদনে।
কহ দাসে কি কৌশলে সৌমিত্রি জিনিবে
দশানন-পুত্র কালি? তোমার প্রসাদে
(কহিলেন বিরূপাক্ষ) ঘোরতর রণে
নাশিবে লক্ষ্মণ শূর মেঘনাদ শূরে।"[৩০]

বঙ্কিমচন্দ্রের 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থেও আমরা আলাপনের ঢঙ দেখেছি। ধর্মতত্ত্ব গ্রন্থে মোট ২৮ টি অধ্যায় আছে। প্রত্যেকটি অধ্যায়েই বিষয়বস্তুকে প্রকাশ করা হয়েছে দুটি চরিত্রের মধ্যে কথোপকথনকে অবলম্বন করে। একজন গুর এবং আরেকজন শিষ্য। আমরা নবম অধ্যায় (জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি) থেকে একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি। —

> "শিষ্য। শারীরিক বৃত্তির অনুশীলন সম্বন্ধে কিছু উপদেশ পাইয়াছি, এক্ষণে জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তির অনুশীলন সম্বন্ধে কিছু শুনিতে ইচ্ছা করি। আমি যত দূর বুঝিয়াছি, তাহা এই যে, অন্যান্য বৃত্তির ন্যায় এ সকল বৃত্তির অনুশীলনে সুখ, ইহাই ধর্ম্ম। অতএব জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি সকলের অনুশীলন এবং জ্ঞানোপার্জ্জন করিতে হইবে।
>
> গুরু। ইহা প্রথম প্রয়োজন। দ্বিতীয় প্রয়োজন, জ্ঞানোপার্জ্জন ভিন্ন অন্য বৃত্তির সম্যক্ অনুশীলন করা যায় না। শারীরিক বৃত্তির উদাহরণ দ্বারা ইহা বুঝিয়াছি। ইহা ভিন্ন তৃতীয় প্রয়োজন আছে। তাহা বোধ হয়, সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর। জ্ঞান ভিন্ন ঈশ্বরকে জানা যায় না। ঈশ্বরের বিধিপূর্ব্বক উপাসনা করা যায় না।
>
> শিষ্য। তবে কি মূর্খের ঈশ্বরোপসনা নাই? ঈশ্বর কি কেবল পণ্ডিতের জন্য?
>
> গুরু। মূর্খের ঈশ্বরোপসনা নাই। মূর্খের ধর্ম্ম নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পৃথিবীতে যত অজ্ঞানকৃত পাপ দেখা যায়, সকলই প্রায় মূর্খের কৃত। তবে একটা ভ্রম সংশোধন করিয়া দিই। যে লেখাপড়া জানে না, তাহাকেই মূর্খ বলিও না। আর যে লেখাপড়া করিয়াছে তাহাকেই জ্ঞানী বলিও না। জ্ঞান পুস্তকপাঠ ভিন্ন অন্য প্রকারে উপার্জিত হইতে পারে; জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তির অনুশীলন বিদ্যালয় ভিন্ন অন্যত্র হইতে পারে। আমাদের দেশের প্রাচীন স্ত্রীলোকেরা ইহার উত্তম উদাহরণস্থল।"[৩১]

স্বামী বিবেকানন্দের লেখা 'স্বামি-শিষ্য সংবাদ' একটি চমৎকার বই। এই বইটিও কথোপকথনধর্মী রচনা। জিজ্ঞাসু শিষ্য, গুরুকে জগৎ ও জীবনের সঙ্গে যুক্ত নানা প্রশ্ন করেছেন, স্বামিজী সেগুলোর উত্তর দিয়েছেন। সেই একই স্টাইল। যাকে আমরা বলছি আলাপন। গ্রন্থটিতে ধর্ম, মহাপুরুষ, খাদ্য, সাধনা, ভারতের উন্নতি কিভাবে সম্ভব ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা আছে। বইটি থেকে আমরা কিছু দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করছি। —

> "শিষ্য। মহাশয়, উপনিষৎ দর্শনাদিতে ঈশ্বর যে শক্তিমান্ ব্যক্তি-বিশেষ একথা আছে কি? লোকে কিন্তু ঐরূপ ঈশ্বরে বিশ্বাসবান্।
>
> স্বামিজী। সর্ব্বেশ্বর কখনও ব্যক্তিবিশেষ হতে পারেন না। জীব হচ্ছে ব্যষ্টি; আর সকল জীবের সমষ্টি হচ্ছেন ঈশ্বর। জীবের অবিদ্যা প্রবল; ঈশ্বর বিদ্যা ও অবিদ্যার সমষ্টি মায়াকে বশীভূত করে রয়েছেন। এবং স্বাধীনভাবে এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎটা নিজের ভিতর থেকে Project (বাহির) করেছেন। ব্রহ্ম কিন্তু ঐ ব্যষ্টি-সমষ্টির অথবা জীব ও ঈশ্বরের পারে বর্ত্তমান। ব্রহ্মের অংশাংশ ভাগ হয় না। বোঝাবার জন্য তাঁর ত্রিপাদ, চতুষ্পাদ ইত্যাদি কল্পনা করা হয়েছে মাত্র। যে পাদে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়াধ্যাস হচ্ছে সেই ভাগকেই শাস্ত্র ঈশ্বর বলে নির্দেশ করেছে। অপর ত্রিপাদ, কূটস্থ যাতে কোনরূপ দ্বৈত-কল্পনার ভান নেই তাই ব্রহ্ম।"[৩২]

বাংলা আলাপন সাহিত্যের ধারায় যেই গ্রন্থটি আমাদের সবচেয়ে বেশি নজর কেরেছে সেটি হল, — 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।' পুরো গ্রন্থটি আগাগোড়া আলাপন নির্ভর। অনুগামীরা প্রশ্ন করেছেন। রামকৃষ্ণদেব তার উত্তর দিয়েছেন। তাঁর আলাপনে তিনি সুন্দরভাবে বিভিন্ন উপমার সাহায্যে, কখনও গল্প বলে-বলে বিভিন্ন জটিল বিষয়কে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। তাঁর আলাপনে একদিকে যেমন হাস্যরস আছে তেমনি আছে সাহিত্যিক নানা গুণ। এতক্ষণ আমরা আলাপনধর্মী যেই কয়েকটা বইয়ের সন্ধান পেয়েছি তার মধ্যে অন্যতম হল 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'। পুরোপুরি কথোপকথনের স্টাইলে গ্রন্থটি বলা ও লেখা হয়েছে। আমরা কথামৃত থেকে এখানে একটি উদাহরণ নিয়ে বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করব। সদরওয়ালা ও শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে ঈশ্বর লাভ বিষয়ে কথোপকথন এখানে তুলে ধরছি, —

> "শ্রীরামকৃষ্ণ — ঈশ্বর লাভের জন্য সংসারে থেকে, এক হাতে ঈশ্বরের পাদপদ্ম ধরে থাকবে আর এক হাতে কাজ করবে। যখন কাজ থেকে অবসর হবে, তখন দুই হাতেই ঈশ্বরের পাদপদ্ম ধরে থাকবে, তখন নির্জনে বাস করবে, কেবল তাঁর চিন্তা আর সেবা করবে।
>
> সদরওয়ালা (আনন্দিত হইয়া) — মহাশয়, এ অতি সুন্দর কথা! নির্জনে সাধন চাই বই কি! কিন্তু ঐটি আমরা ভুলে যাই। মনে করি একেবারে জনক রাজা হয়ে পড়েছি! (শ্রীরামকৃষ্ণ ও সকলের হাস্য)। সংসার ত্যাগের যে প্রয়োজন নাই, বাড়িতে থেকেও ঈশ্বরকে পাওয়া যায়, এ কথা শুনেও আমার শান্তি ও আনন্দ হল।
>
> শ্রীরামকৃষ্ণ — ত্যাগ তোমাদের কেন করতে হবে? যে কালে যুদ্ধ করতেই হবে, কেল্লা থেকেই যুদ্ধ ভাল। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুদ্ধ, খিদে-তৃষ্ণা এ সবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। এ যুদ্ধ সংসার থেকেই ভাল। আবার কলিতে অন্নগত প্রাণ, হয়তো খেতেই পেলে না। তখন ঈশ্বর-টীশ্বর সব ঘুরে যাবে।"[৩৩]

শাস্ত্র জ্ঞান এবং ঈশ্বর নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ, মাষ্টার ও গিরিশ ঘোষের মধ্যেকার কথোপকথন এখানে তুলে ধরছি, —

> "শ্রীরামকৃষ্ণ — মহিম চক্রবর্তী অনেক শাস্ত্র-টাস্ত্র দেখেছে শুনেছে — খুব আধার! (মাষ্টারের প্রতি) — কেমন গা?
>
> মাষ্টার — আজ্ঞা হাঁ।
>
> গিরিশ — কি? বিদ্যা! ও অনেক দেখেছি! ওতে আর ভুলি না।
>
> শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে) — এখানকার ভাব কি জান? বই শাস্ত্র এ সব কেবল ঈশ্বরের কাছে পৌছিবার পথ বলে দেয়। পথ, উপায় জেনে লবার পর, আর বই শাস্ত্রে কি দরকার? তখন নিজে কাজ করতে হয়।

> একজন একখানা চিঠি পেয়েছিল, কুটুম বাড়ি তত্ত্ব করতে হবে, কি কি জিনিস লেখা ছিল। জিনিস কিনতে দেবার সময় চিঠিখানা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। কর্ত্তাটি তখন খুব ব্যস্ত হয়ে চিঠি খোঁজ আরম্ভ করলেন। অনেকক্ষণ ধরে অনেকজন মিলে খুঁজলে। শেষে চিঠিখানা পাওয়া গেল। তখন আর আনন্দের সীমা নাই। কর্ত্তা ব্যস্ত হয়ে অতি যত্নে চিঠিখানা হাতে নিলেন আর দেখতে লাগলেন, কি লেখা আছে। লেখা এই, পাঁচ সের সন্দেশ পাঠাইবে, একখানা কাপড় পাঠাইবে; আরও কত কি। তখন আর চিঠির দরকার নাই, চিঠি ফেলে দিয়ে সন্দেশ ও কাপড়ের আর অন্যান্য জিনিসের চেষ্টায় বেরুলেন। চিঠির দরকার কতক্ষণ? যতক্ষণ সন্দেশ, কাপড় ইত্যাদির বিষয় না জানা যায়। তার পরই পাবার চেষ্টা।
> শাস্ত্রে তাকে পাবার উপায়ের কথা পাবে। কিন্তু খবর সব জেনে কর্ম আরম্ভ করতে হয়। তবে তো বস্তুলাভ!"[৩৪]

রবীন্দ্রনাথে এসেও আমরা এমন রচনার সন্ধান পেয়েছি যেখানেও বক্তব্য বিষয় প্রকাশ পেয়েছে আলাপনের হাত ধরে। আমরা আলোচনা করছি 'পঞ্চভূত' নিয়ে। সৌন্দর্য, নরনারী, পল্লীগ্রাম, মন, গদ্য ও পদ্য, কাব্যের তাৎপর্য, কৌতুকহাস্য ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আর এইসব আলোচনায় অংশ নিয়েছে ক্ষিতি, ব্যোম, দীপ্তি, স্রোতস্বিনী, সমীর এবং লেখক নিজে। সহজ-সরল ভাষায় যাকে আমরা বলছি কথা। পঞ্চভূতের 'নরনারী' প্রবন্ধ থেকে আমরা একটি উদাহরণ তুলে ধরছি। –

> "সমীর এক সমস্যা উত্থাপিত করিলেন, তিনি বলিলেন – ইংরেজি সাহিত্যে গদ্য অথবা পদ্য কাব্যে নায়ক এবং নায়িকা উভয়ের মাহাত্ম্য পরিস্ফুট হইতে দেখা যায়। ডেসডিমোনার নিকট ওথেলো এবং ইয়াগো কিছুমাত্র হীনপ্রভ নহে; ক্লিয়োপাট্রা আপনার শ্যামল বঙ্কিম বন্ধনজালে এণ্টনিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে বটে, কিন্তু তথাপি লতাপাশবিজড়িত ভগ্ন জয়স্তম্ভের ন্যায় এণ্টনির উচ্চতা সর্বসমক্ষে দৃশ্যমান রহিয়াছে। লামার্‌মুরের নায়িকা আপনার সকরুণ সরল সুকুমার সৌন্দর্যে যতই আমাদের মনোহরণ করুক-না কেন, রেভ্‌ন্‌স্‌উডের বিষাদঘনঘোর নায়কের নিকট হইতে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া লইতে পারে না। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে দেখা যায় নায়িকারই প্রাধান্য। কুন্দনন্দিনী ও সূর্যমুখীর নিকট নগেন্দ্র ম্লান হইয়া আছে, রোহিণী এবং ভ্রমরের নিকট গোবিন্দলাল অদৃশ্যপ্রায়, জ্যোতির্ময়ী কপালকুণ্ডলার পার্শ্বে নবকুমার ক্ষীণতম উপগ্রহের ন্যায়। প্রাচীন বাংলা কাব্যেও দেখো। বিদ্যাসুন্দরের মধ্যে সজীব মূর্তি যদি কাহারও থাকে তবে সে কেবল বিদ্যার ও মালিনীর, সুন্দরচরিত্রে পদার্থের লেশমাত্র নাই। কবিকঙ্কণ চণ্ডীর সুবৃহৎ সমভূমির মধ্যে কেবল ফুল্লরা এবং খুল্লনা একটু নড়িয়া বেড়ায়, নতুবা ব্যাধটা একটা বিকৃত বৃহৎ স্থাণুমাত্র এবং ধনপতি ও তাঁহার পুত্র কোনো কাজের নহে। বঙ্গসাহিত্যে পুরুষ মহাদেবের ন্যায় নিশ্চল ভাবে ধূলিশয়ান এবং রমণী তাহার বক্ষের উপর জাগ্রত জীবন্ত ভাবে বিরাজমান। ইহার কারণ কী?
> সমীরের এই প্রশ্নের উত্তর শুনিবার জন্য স্রোতস্বিনী অত্যন্ত কৌতূহলী হইয়া উঠিলেন এবং দীপ্তি নিতান্ত অমনোযোগের ভান করিয়া টেবিলের উপর একটা গ্রন্থ খুলিয়া তাহার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাখিলেন।
> ক্ষিতি কহিলেন – তুমি বঙ্কিমবাবুর যে কয়েকখানি উপন্যাসের উল্লেখ করিয়াছ সকলগুলিই মানসপ্রধান, কার্যপ্রধান নহে। মানসজগতে স্ত্রীলোকের প্রভাব অধিক, কার্যজগতে পুরুষের প্রভুত্ব। যেখানে কেবলমাত্র হৃদয়বৃত্তির কথা সেখানে পুরুষ স্ত্রীলোকের সহিত পারিয়া উঠিবে কেন? কার্যক্ষেত্রেই তাহার চরিত্রের যথার্থ বিকাশ হয়।
> দীপ্তি আর থাকিতে পারিল না – গ্রন্থ ফেলিয়া এবং ঔদাসিন্যের ভান পরিহার করিয়া বলিয়া উঠিল – কেন? দুর্গেশনন্দিনীতে বিমলার চরিত্র কি কার্যেই বিকশিত হয় নাই?"[৩৫]

আলাপন সাহিত্যের আরেকটি দিকও আমরা উল্লেখ করতে চাই। সেটি হল বৈঠকি গল্প। গোপালচন্দ্র রায়ের 'শরৎচন্দ্র' বইটির সৌজন্যে আমরা আলাপনের এই নতুন দিকটি সম্বন্ধে জানতে পারি। শরৎচন্দ্রের একটি অদ্ভুত গুণ ছিল।

বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে-দিতে তিনি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গল্প বলে যেতেন। বৈঠকি আড্ডায় জমে উঠত তাঁর এই গল্পগুলো। বেশিরভাগ গল্পই ছিল তাঁর নিজের দেখা বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে নেওয়া। তারপর কথার সূত্র ধরে তিনি গল্প এগিয়ে নিয়ে যেতেন। কোন ভাবনা-চিন্তা ছাড়াই তিনি গল্পকে এগিয়ে নিয়ে যেতেন এবং তাকে পূর্ণ রূপও দিতেন। যদিও বৈঠকি গল্পে কথকই আসল ভূমিকা নিতেন, তাসত্ত্বেও একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, শ্রোতা সেখানে উদ্দীপকের কাজ করতেন। শরৎচন্দ্রের বৈঠকি গল্পগুলোর মধ্যে অন্যতম হল, — গুরুদেবের জাহাজ ভক্ষণ, বিধবা বিবাহ, নিরুদিদি, অপারেশন, বরযাত্রী, কাশীর ভূত, যাত্রা, প্রেমে পড়া, চাকরি, ভুল বুঝা, জামাই আদর ইত্যাদি। এগুলোর মধ্যে গুরুদেবের জাহাজ ভক্ষণ গল্পটি তিনি সাহিত্যিক বনফুলের অনুরোধে আড্ডা দিতে-দিতে বলেন।[৩৬] আবার বিধবা বিবাহ গল্পটি উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও কুমুদচন্দ্র রায়চৌধুরী শরৎচন্দ্রের বাড়িতে বসে কথা প্রসঙ্গে শোনেন।[৩৭] এইরকমভাবে প্রত্যেকটি বৈঠকি গল্পই তিনি কারোর না কারোর অনুরোধে বা কথা বলতে-বলতে বলেছেন। লেখক গোপালচন্দ্র রায়, শরৎচন্দ্র সম্পর্কে বলেছেন, —

> "শরৎচন্দ্র এমন মজলিসী মানুষ ছিলেন যে, একবার তাঁর কাছে গেলে, তাঁর হাস্য-পরিহাস ও গল্প ছেড়ে তাঁর কাছ থেকে ওঠা কঠিন হত। একমনে তাঁর কথা শুনতেই হত। তাঁর কথা বলার মধ্যে এমনই একটা যাদু ছিল।"[৩৮]

আবার উপস্থিত বুদ্ধি খাটিয়ে অনেক আগন্তুক মানুষের সঙ্গে হঠাৎ করে দেখা হলে, কথা প্রসঙ্গে তিনি অনেক হাস্যরসের সৃষ্টি করতেন। কিন্তু এই সবকিছুই হত কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে। কথা বলতে বলতেই তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগুলো করতেন। অর্থাৎ বৈঠকি গল্প বা হাস্যরসের সৃষ্টিতেও আগাগোড়া আলাপের একটি ঢঙ বা স্টাইল আমরা লক্ষ্য করছি।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আলাপন সাহিত্যের ধারার কথা আলোচনা করতে গিয়ে আমরা 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' গ্রন্থের পরে অনুকূলচন্দ্র চক্রবর্তীর এমন কিছু বইয়ের সন্ধান পেয়েছি যেগুলো পুরোপুরি কথোপকথন নির্ভর। অনুকূলচন্দ্রের এইরকম বইয়ের সংখ্যা ৪৮টি।

১. আলোচনা-প্রসঙ্গে। (মোট ২৩টি খণ্ড)
২. দীপরক্ষী। (মোট ১১ টি খণ্ড)
৩. প্রতুলদীপ্তি। (মোট ৪ টি খণ্ড)
৪. নানা প্রসঙ্গে। (মোট ৪ টি খণ্ড)
৫. কথা প্রসঙ্গে। (মোট ৩ টি খণ্ড)
৬. অমিয়-বাণী।
৭. ইসলাম প্রসঙ্গে।
৮. নারীর পথে।

ওপরে উল্লেখ্য বইগুলোর কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। এর মধ্যে অমিয়-বাণী, ইসলাম প্রসঙ্গে, নারীর পথে, কথা প্রসঙ্গে ও নারীর পথে গ্রন্থের প্রশ্নকর্তা একজন। যেমন, 'অমিয়-বাণী' গ্রন্থের প্রশ্নকর্তা শ্রী অশ্বিনীকুমার বিশ্বাস। 'ইসলাম প্রসঙ্গে' গ্রন্থের প্রশ্নগুলো করেছেন মোহাম্মদ খলিলর রহমান ও কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য। 'নানা-প্রসঙ্গে' গ্রন্থের প্রশ্নকর্তা শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য। 'নারীর পথে' গ্রন্থের প্রশ্নকর্তা পঞ্চানন সরকার। 'কথা প্রসঙ্গে' গ্রন্থের প্রশ্নগুলো করেছেন শ্রী সুশীলকুমার বসু। আর 'আলোচনা প্রসঙ্গে', 'দীপরক্ষী' এবং 'প্রতুলদীপ্তি' গ্রন্থে আছে সমাজের নানা ধরনের মানুষের প্রশ্ন। এই গ্রন্থগুলোর সঙ্কলক হলেন, যথাক্রমে প্রফুল্লকুমার দাস, দেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও মণিলাল চক্রবর্তী।

অনুকূলচন্দ্র চক্রবর্তীর আলাপন ধর্মী এইসব গ্রন্থগুলোতে কথোপকথনের স্টাইল আমরা লক্ষ্য করি। প্রশ্নকর্তারা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করতেন আর অনুকূলচন্দ্র সেগুলোর উত্তর দিতেন। এক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় কথোপকথনের কোন নির্ধারিত রূপরেখা ছিল না। জগৎ ও জীবনের নানা সমস্যা, দর্শন, সাহিত্য, দেশ, আধ্যাত্মিকতা ইত্যাদি নানা বিষয় সংক্রান্ত আলোচনা চলত। আমরা অনুকূলচন্দ্রের আলাপন জাতীয় বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে কিছু দৃষ্টান্ত এখানে তুলে ধরছি।

১. মানুষ concentric হলে কেমন হয়, এই প্রসঙ্গে তিনি কথা প্রসঙ্গে বলেন, —

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 69
Website: https://tirj.org.in, Page No. 581 - 596
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "মানুষ যখন actively concentric (সক্রিয়ভাবে সুকেন্দ্রিক) হয় তখন সে, people- এর (জনসাধারণের) প্রতি sypathetic (সহানুভূতিশীল) হয়। সেই রকমটাই radiated (বিচ্ছুরিত) হয়ে থাকে। আমি যদি আমার সাথে ভাল ব্যবহার করলে খুশী হই তাহলে আমি অপরের সাথেও ভাল ব্যবহার করব না কেন? ছোট থেকেই আমি ঐরকম করতাম। শুধু মুখেই যে করতাম তা না। হাতেকলমে করতাম। ছোটকালে সবাই আমার guardian (অভিভাবক) ছিল। যাত্রা শুনতে যেতাম। সেখানে কান ধরত, চড় মারত। সেইজন্য আসরে বসে যাত্রা শুনতাম না। Boundary-র (সীমানার) বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতাম। কিন্তু তার জন্য আমি কখনও কারো সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করিনি। পরে মানুষ আমাকে কত আদর করত, সামনে নিয়ে বসাত, তামুক দিত, পান দিত, মোসাহেব জোগাড় করত। মোট কথা, হাতেকলমে ভাল ব্যবহার করতে-করতে character-ই (চরিত্রই) ভাল হয়ে যায়। ঐরকম করে তোলে। তখন সে বাইরের impulse-এ (সাড়ায়) যা করে বা বলে তাতে ভালটাই ফুটে বেরোয়।"[৩৯]

২. পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার অধ্যক্ষ শ্রী বঙ্কিম কর মহাশয়ের সঙ্গে অনুকূলচন্দ্রের কথোপকথনের কিছু অংশ এখানে তুলে ধরছি,—

> "বঙ্কিম বাবু — বিশেষ পদে অধিষ্ঠিত থাকার দরুন আমার অনেক কাজ করার সুবিধা হয়। বিধান-সভার অধ্যক্ষ আছি। আপনার আশীর্বাদে কাজ করবার সুযোগটা বেশি পাই। কিন্তু এর সাথে পদমর্যাদার আকাঙ্ক্ষাও থাকে।
>
> শ্রীশ্রীঠাকুর — মানুষ যদি আপনাকে ভালবাসে তবে মানুষই আপনাকে পদে প্রতিষ্ঠিত করে দেবে। মানুষ আপনার যত আপন হয়ে উঠবে। আপনি যত মানুষ-দরদী হয়ে উঠবেন, মানুষ আপনাকে যতই চাইবে ততই আপনি আরো হতে আরো হয়ে উঠবেন।"[৪০]

৩. 'অমিয়-বাণী' গ্রন্থে অশ্বিনীকুমার বিশ্বাস শাস্ত্র জানার ফলে আমাদের পূর্ণ জ্ঞান হয় কি না, সেই বিষয়ে প্রশ্ন করলে, অনুকূলচন্দ্র বলেন, —

> "তারা ঠিকই লিখেছেন কিন্তু শাস্ত্র পড়ে লোকে ঠিক-ঠিক তাঁদের ভাব গ্রহণ করতে পারে না; নিজের মন-অনুযায়ী করে নিতে বাধ্য হয়। যেমন আপনি Victoria Park (ভিক্টোরিয়া পার্ক) দেখে এসে বর্ণনা লিখে রেখেছেন, আমি সেটা পড়ে একটা idea (ধারণা) করে নিতে পারি বটে, কিন্তু ষোল আনা ঠিক হবে না; আমার দেখা পার্ক-এর idea (ধারণা) সঙ্গে জুড়ে একটা কল্পনা করে নিতে পারি; সেটা হয়তো কতক পরিমাণে ঠিক হতেও পারে, কিন্তু নিজে গিয়ে যখন দেখব তখন দেখতে পাব কল্পনাটা সব ঠিক হয় নাই, details-এ (সূক্ষ্মাংশে) অনেক গরমিল। আবার, তখন আপনার বর্ণনা পাঠ করে হয়তো দেখতে পাবো যে সেটাও ঠিকই লেখা আছে, কিন্তু আমার কল্পনাটা তথাপি ঠিক হয়েছিল না। তাতে আপনার বর্ণনার বা শাস্ত্রের দোষ না হতে পারে কিন্তু যে তা পড়ে idea (ধারণা) করে নেয়, তার মনের সংস্কারের ছাপেও অনেকটা গোলমাল হয়ে যেতে পারে। তাই, নিজে গিয়ে না দেখলে প্রায়ই ঠিক-ঠিক জ্ঞান হয় না।"[৪১]

৪. সাহিত্য কেমন হওয়া উচিত সেই প্রসঙ্গে একজন অধ্যাপক প্রশ্ন করলে, অনুকূলচন্দ্র বলেন, —

> "আমি প্রথমে দেখি জীবনীয় প্রসঙ্গটা। আমি ভাল থাকতে চাই, ভালভাবে জীবনযাপন করে চলতে চাই, আনন্দে থাকতে চাই। আর আমার এই থাকাটা ও বেড়ে ওঠাটা পারিপার্শ্বিককে নিয়েই হতে চায়। সুসাহিত্য তো তাই যা গণসমষ্টির হিতসাধন করে, যা নবপ্রেরণা ও আনন্দ দান করে সমাজের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধন করতে পারে। সাহিত্য জীবনীয় বিপ্লব অর্থাৎ জীবনীয় লওয়াজিমার উচ্চেতনী প্লাবন সৃষ্টি করে দেশ, জাতি ও সমাজের হিতসাধন করে। তাই সাহিত্যের মধ্যে জীবনীয় দিকটা যত প্রাধান্যলাভ করে ততই মঙ্গল। আমার এইরকম ভাব। অনেকের হয়তো আবার তা নয়। আবার অনেকের হয়তো আমি যেমনতর বললাম, তেমনতর।"[৪২]

বিভিন্ন বিষয়কেন্দ্রিক এইসব আলোচনার মধ্যে দিয়ে সাহিত্যিক স্বাদুতাও প্রকাশ পেয়েছে। কেবলমাত্র অনুকূলচন্দ্র চক্রবর্তীর কথোপকথনধর্মী রচনাগুলোতেই নয়, সেইসঙ্গে রামকৃষ্ণদেবের কথামৃত, বিবেকানন্দের স্বামি-শিষ্য সংবাদ এবং বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্ত্ব গ্রন্থের জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি প্রবন্ধেও আমরা সাহিত্যিক স্বাদুতা লক্ষ্য করেছি। কোথাও কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে উপমার ব্যবহার করে বক্তব্য বিষয়কে সহজ করার হয়েছে, কোথাও প্রাবন্ধিকের মতো সুক্ষ্ম ও বস্তুনিষ্ঠ মন নিয়ে অল্প পরিসরে বক্তব্যকে তুলে ধরা হয়েছে। কোথাও আবার ছোট-ছোট গল্পের মধ্যে দিয়ে এই কাজ করা হয়েছে। আর বক্তব্য বিষয়কে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে কখনও তৎসম, তদ্ভব, বা বিদেশি শব্দ আবার কখনও আঞ্চলিক ভাষা বা স্থানীয় শব্দের প্রয়োগ। এক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ ও অনুকূলচন্দ্রের ভূমিকা উল্লেখ করতেই হয়।

আমরা এতক্ষণ সাহিত্য জগৎ-এর এমন এক অনালোচিত বিষয় নিয়ে আলোচনার চেষ্টা করলাম, যা পণ্ডিতমহলে ব্রাত্যই রয়ে গেছে। পারস্পরিক কথা বলার মধ্যে দিয়ে বক্তব্য বিষয়কে উপস্থাপন করা এবং প্রয়োজনের কথা হয়েও সেখানে সাহিত্যের প্রাঞ্জলতা প্রকাশ পাওয়া — এই ছিল আমার আলোচনার মূল। কথোপকথনের মধ্যে দিয়েও যে সাহিত্যরস ফুটে উঠতে পারে সেই কথাই আমি চেষ্টা করেছি আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনায় প্রতিষ্ঠা করতে। আর কথোপকথনধর্মী এই সাহিত্যকেই আমরা বলছি আলাপন সাহিত্য। আমাদের বিশ্বাস আলাপন সাহিত্যের গভীরে যদি খনন চলে তাহলে এখানেও সাহিত্যের অনেক মণি-মুক্তোর খোঁজ পাওয়া যাবে।

Reference:

১. বসু, রাজশেখর, বাল্মীকি রামায়ণ সারানুবাদ, এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা : ৭৩; নবম মূদ্রণ, ১৩৯০; পৃ. ৭০
২. পূর্বোক্ত গ্রন্থ; পৃ. ৭১
৩. পূর্বোক্ত গ্রন্থ; পৃ. ১২৯
৪. পূর্বোক্ত গ্রন্থ; পৃ. ১৩৮
৫. পূর্বোক্ত গ্রন্থ; পৃ. ১৩৯
৬. মহাভারত (প্রথম খণ্ড); অনুবাদ : সাহিত্যাচার্য পণ্ডিত রামনারায়ণদত্ত শাস্ত্রী; গীতাপ্রেস, গোরোখপুর : ০৪; সপ্তদশ মুদ্রণ; পৃ. ১৩৮৫
৭. পূর্বোক্ত গ্রন্থ; পৃ. ১৩৯৬
৮. পূর্বোক্ত গ্রন্থ; পৃ. ১৩৯৭
৯. পূর্বোক্ত গ্রন্থ; পৃ. ১৩৯৭
১০. শ্রীমদ্ভগবদগীতা যথাযথ; স্বামী প্রভুপাদ; ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট; মায়াপুর - ১৩; চতুর্থ সংস্করণ ২০১০; পৃ. ১৯৩
১১. পূর্বোক্ত গ্রন্থ; পৃ. ১৯৪
১২. পূর্বোক্ত গ্রন্থ; পৃ. ২৮৭
১৩. পূর্বোক্ত গ্রন্থ; পৃ. ২৮৮
১৪. পূর্বোক্ত গ্রন্থ; পৃ. ২৯১
১৫. দাশ, নির্মল, চর্যাগীতি পরিক্রমা, দাশ; দে’জ পাবলিশিং; কলকাতা-৭৩; তৃতীয় সংস্করণ ২০০৫; পৃ. ১৩২
১৬. পূর্বোক্ত গ্রন্থ; পৃ. ১৩৭
১৭. পূর্বোক্ত গ্রন্থ; পৃ. ১৫৩
১৮. ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন, বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য; দে’জ পাবলিশিং; কলকাতা : ৭৩; একাদশ সংস্করণ; ২০০৮; পৃ. ২৬৪

১৯. পূর্বোক্ত গ্রন্থ; পৃ. ৩৭১

২০. চৌধুরী, বিশ্বনাথ (সম্পাদনা), কৃত্তিবাসী রামায়ণ; তরুণ প্রিন্টার্স, কলকাতা : ১২; প্রকাশ ১৩৪৭; পৃ. ৪৯

২১. পূর্বোক্ত গ্রন্থ; পৃ. ১৫২

২২. দাস, কাশীরাম (সম্পাদনা), কাশীদাসী মহাভারত: পূর্ণচন্দ্র শীল; অক্ষর প্রেস, কলকাতা : ২৭; প্রকাশ ১৩৩২; পৃ. ২৯৮

২৩. পূর্বোক্ত গ্রন্থ; পৃ. ৫৩৪

২৪. পূর্বোক্ত গ্রন্থ; পৃ. ৫৩৫

২৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার, ও বিশ্বপতি চৌধুরী (সম্পাদনা), কবিকঙ্কণ-চণ্ডী; কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস; কলকাতা- ১৯; পুনর্মুদ্রিত ১৯৭৪; পৃ. ১৮৯-১৯০

পূর্বোক্ত গ্রন্থ; পৃ. ২০৫-২০৬

২৭. ভট্টাচার্য, রামেশ্বর, শিবায়ন, পাঠ নির্বাচক ঈশানচন্দ্র বসু; বঙ্গবাসী মেসিন প্রেস (প্রকাশ : শ্রীনুটবিহারী রায়); কলকাতা-২; দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩১০; পৃ. ২৩৯-২৪০

২৮. সেনগুপ্ত, সুবোধচন্দ্র (সম্পাদিত); শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত; পি, সি, মজুমদার এণ্ড ব্রাদার্স; কলকাতা : ২২; প্রকাশ : ১৯৪১; পৃ. ১৯৭-১৯৮

২৯. সেন, দীনেশচন্দ্র (সংকলক), মৈমনসিংহ-গীতিকা; কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস; কলকাতা-১৯ তৃতীয় সংস্করণ ১৯৫৮; পৃ. ১১

৩০. মধুসূদন রচনাবলী; সাহিত্যম; কলকাতা-৭৩; প্রথম সাহিত্যম সংস্করণ ২০০৫; পৃ. ৫১

৩১. বঙ্কিম রচনা সমগ্র; দ্বিতীয় খণ্ড; ইউনাইটেড পাবলিশার্স; কলকাতা-৯; প্রথম ইউনাইটেড সংস্করণ ২০০০; পৃ. ২২৭

৩২. চক্রবর্তী, শরচ্চন্দ্র (সম্পাদনা), স্বামি-শিষ্য সংবাদ; উদ্বোধন কার্য্যালয়; ১ উদ্বোধন লেন;কলকাতা; অষ্টম সংস্করণ ১৩৫৩; পৃ. ৬৭-৬৮

৩৩. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত (অখণ্ড); শ্রী ম সঙ্কলিত; মাইতি বুক হাউস; কলকাতা-৭৩; চতুর্থ প্রকাশ ২০১৭; পৃ. ১৪৬

৩৪. পূর্বোক্ত গ্রন্থ; পৃ. ১৭৭

৩৫. রবীন্দ্ররচনাবলী ; রিফ্লেক্ট পাব্লিকেশন, কলকাতা-৯; প্রথম প্রকাশ ২০০৬; পৃ. ৫৯১-৫৯২

৩৬. শরৎচন্দ্র; গোপালচন্দ্র রায়; সাহিত্য সদন; কলকাতা ১২; প্রথম প্রকাশ ১৯৬১; পৃ. ১৮৩

৩৭. পূর্বোক্ত গ্রন্থ; পৃ. ১৯২

৩৮. পূর্বোক্ত গ্রন্থ; ভূমিকা; পৃ. 'চ'

৩৯. চক্রবর্তী, শ্রী অনুকূলচন্দ্র, দীপরক্ষী; তৃতীয় খণ্ড; সঙ্কলক : দেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়; সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, কলকাতা ১২; প্রথম প্রকাশ ১৩৯৯; পৃ. ৬১

৪০. চক্রবর্তী, শ্রী অনুকূলচন্দ্র, প্রতুলদীপ্তি; প্রথম খণ্ড; সঙ্কলক : মণিলাল চক্রবর্তী; সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, কলকাতা ০৬; প্রথম সংস্করণ ২০২৪; পৃ. ১০১

৪১. চক্রবর্তী, শ্রী অনুকূলচন্দ্র, অমিয়-বাণী; প্রশ্নকর্তা : অশ্বিনীকুমার বিশ্বাস; সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, কলকাতা ০৯; সপ্তম সংস্করণ ১৪১৪; পৃ. ৫০

৪২. চক্রবর্তী, শ্রী অনুকূলচন্দ্র, প্রতুলদীপ্তি; প্রথম খণ্ড; সঙ্কলক : মণিলাল চক্রবর্তী; সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, কলকাতা ০৬; প্রথম সংস্করণ ২০২৪; পৃ. ৭২

Bibliography:

রাজশেখর বসু : বাল্মীকি রামায়ণ, এম, সি, সরকার এন্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭৩, অষ্টম মুদ্রণ, ১৩৮৭

পণ্ডিত রামনারায়ণদত্ত শাস্ত্রী : মহাভারত, গীতা প্রেস, গোরখপুর ০০৪, সপ্তদশ মুদ্রণ,

স্বামী প্রভুপাদ : শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট, মায়াপুর ১৩, চতুর্থ সংকরণ ২০১০

নির্মল দাস : চর্যাগীতি পরিক্রমা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, তৃতীয় সংস্করণ ২০০৫

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য : বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, একাদশ সংস্করণ ২০০৮

বিশ্বনাথ চৌধুরী : কৃত্তিবাসী রামায়ণ, তরুণ প্রিন্টার্স, কলকাতা ১২, প্রকাশ ১৩৪৭

পূর্ণচন্দ্র শীল : কাশিদাসী মহাভারত, অক্ষর প্রেস, কলকাতা ২৭, প্রকাশ ১৩৩২।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও কবিকঙ্কণ চণ্ডী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, বিশ্বপতি চৌধুরী : কলকাতা ১৯, পুনর্মুদ্রিত ১৯৭৪

ঈশানচন্দ্র বসু : শিবায়ন, বঙ্গবাসী মেসিন প্রেস, কলকাতা ০২, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩১০

সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত : শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, পি, সি, মজুমদার এন্ড ব্রাদার্স, কলকাতা ২২, প্রকাশ ১৯৪১

দীনেশচন্দ্র সেন : মৈমনসিংহ গীতিকা, কলকাতা বিশবিদ্যালয় প্রেস, কলকাতা ১৯, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৫৮

মধুসূদন দত্ত : সাহিত্যম, কলকাতা ৭৩, প্রথম সংস্করণ ২০০৫

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : বঙ্কিম রচনা সমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড, ইউনাইটেড পাবলিশার্স, কলকাতা ০৯, প্রথম সংস্করণ ২০০০

শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী : স্বামি-শিষ্য সংবাদ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, অষ্টম সংস্করণ ১৩৫৩

শ্রী ম : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, মাইতি বুক হাউস, কলকাতা, ৭৩, চতুর্থ প্রকাশ ২০১৭

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রবীন্দ্র রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, কলকাতা ০৯, প্রথম প্রকাশ ২০০৬

গোপালচন্দ্র রায় : শরৎচন্দ্র, সাহিত্য সদন, কলকাতা ১২, প্রথম প্রকাশ ১৯৬১

অনুকূলচন্দ্র চক্রবর্তী : দীপরক্ষী, তৃতীয় খণ্ড, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, কলকাতা ১২, প্রথম প্রকাশ ১৩৯৯

অনুকূলচন্দ্র চক্রবর্তী : অমিয়-বাণী, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, কলকাতা ০৯, সপ্তম সংস্করণ ১৪১৪

অনুকূলচন্দ্র চক্রবর্তী : প্রতুলদীপ্তি, প্রথম খণ্ড, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, কলকাতা ০৬, প্রথম সংস্করণ ২০২৪